চিরকালীন নজর ল

চিরকালীন নজরুল

ড. দিল আফরোজ বেগম

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Cirokalin Nazrul by **Dr. Dil Afroz Begum**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : March 2021
Price : 200.00
US $ 10
ISBN 978 984 95672 1 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

নিয়ত যে আমার প্রেরণা
আমার বেঁচে থাকার আনন্দ উৎস–

আমার আত্মজ
আবু হেনা মোরশেদ জামানকে

ভূমিকা

বরাবরই সাহিত্যের প্রতি রয়েছে আমার প্রচ ভালোবাসা। যদিও আমি সৃষ্টিশীল কেউ নই। তবুও মাঝে মাঝে কিছু লেখালেখি করার চেষ্টা করি। বিশেষ করে কাজী নজর ল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমাকে বিস্ময়ের জগতে নিয়ে যায়। আর সে বিস্ময় থেকে তৈরি হয়েছে এ লেখাগুলো। নজর ল সাহিত্য পাঠ আমাকে যেভাবে আনন্দিত করে, ভাবিয়ে তোলে, উজ্জীবিত করে তা ভাগাভাগি করে নিতে চাই পাঠকের সাথে– সেখানেই আমার আনন্দ।

উলে- খ্য যে, লেখাগুলো প্রায় সবকটাই ছয়-সাত বছর আগের সৃষ্টি। কারণ দুরারোগ্য কর্কটরোগ আমার ওপর ভর করে অনেকটা সময় কেড়ে নিয়েছে। বর্তমানে স্রষ্টার অপরিসীম কর ণা ও মানুষের ভালোবাসার জোরে সুস্থ আছি। তাই আশা রাখছি আবারও সবার সাথে আমার কলম মিলিত হবে।

আপনাদের শুভকামনা প্রত্যাশা করছি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধগুলোকে গুছিয়ে আবার আলোর সামনে নিয়ে আসার জন্য যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে মাহমুদুল হাসান মামুন এবং আমার ছেলে আবু হেনা মোরশেদ জামানের কথা বিশেষভাবে না বললেই নয়। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই 'অনিন্দ্য প্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ আফজাল হোসেন কে, যাঁর উদ্যোগ ও সহযোগিতায় 'চিরকালীন নজর ল' আলোর মুখ দেখল।

প্রফেসর ড. দিল আফরোজ বেগম

সূচিপত্র

শিশুসাহিত্যে নজরুল ১১
চট্টগ্রামে নজরুল ২৪
নজরুলের কবিতা ও গানে ভাটি বাংলার রূপ ৩১
নজরুলের রচনায় প্রেমের স্বরূপ ৩৫
নজরুল কাব্যে নারীচরিত্রের বিচিত্রতা ৩৮
নজরুলের 'নারী' কবিতায় সমাজ-সচেতনতা ৪১
নজরুল কাব্যে রোমান্টিকতা : প্রেম ও প্রকৃতি ৪৬
যৌবনের কবি নজরুল ৫৫
নজরুল কাব্যে অসাম্প্রদায়িকতা ৬০
গদ্যরচনায় নজরুল ৬৩
নাট্যকার নজরুল ৬৭
নজরুল প্রবন্ধে স্বদেশ চেতনা ৭৪
কালজয়ী নজরুল ৭৭

শিশুসাহিত্যে নজর ল

সত্য, সুন্দর ও মানবতার মুক্ত চেতনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজর লের আবির্ভাব। ১৮৯৯ সনের ২৪শে মে (১৩০৬, ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুর লিয়া গ্রামে কবি কাজী নজর ল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়টা ছিল সংগ্রাম ও বিপ- বের। যুগটা ছিল একাধারে উজ্জীবন ও যন্ত্রণার। আর এ সবকিছু জীবেন জড়িয়ে বেড়ে উঠলেন নজর ল। শৈশবে পিতৃহারা হন। সংসারের আর্থিক দৈন্য অল্প বয়সেই তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে। মাত্র দশ বছর বয়সে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ফেলতে তিনি বাধ্য হন। এরপর এক মৌলবি সাহেবের কাছে তিনি ফারসি ও আরবি শেখেন। পরবর্তীকালে নানাভাবে তিনি কিছু উপার্জনের চেষ্টা করতে থাকেন।

ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী নজর ল ছোটোবেলা থেকেই কবির শক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই তিনি লেটোদলের জন্য পালা লিখতে শুর করেন। লেটো নাচ ও গানের দলে যোগ দিয়ে তিনি যেমন কিছু উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি চমৎকার গান উপহার দিয়ে দলকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন। শৈশবেই নজর লের কবিত্ব শক্তি আলাদা বৈশিষ্ট নিয়ে ফুটে উঠেছিল। লেটোদলে 'রাজপুত্র', 'চাষারস'; ইত্যাদি গীতিনাট্য ও কবিগান পাঁচালি রচনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। শিশু বয়সের রচনা বলেই এগুলোতে সহজসরল অনাবিল ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রচুর উর্দু, আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল তাঁর রচনায়। যুগের প্রভাবে অন্যান্য কবিয়ালদের মতো ইংরেজি শব্দ ও পদ প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

দুঃখ দিয়ে শুর হওয়া জীবন দুখু মিয়ার। সে জীবনে আলোর ছটা দেখা গেল আসানসোলের পুলিশ ইনস্পেকটর কাজী রফিজউল- াহর সাথে তাঁর পরিচয় হওয়ার পর। নজর লের

অসাধারণ প্রতিভা দারোগা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কবিকে তাঁর নিজ গ্রাম ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে আসেন এবং ত্রিশাল বাজারের কাছাকাছি দরিরামপুরে স্কুলে ভর্তি করে দেন। এ সময় তাঁর প্রতিভা নানাভাবে বিকশিত হতে থাকে। স্কুলে গান, অভিনয়, বিতর্ক, আবৃত্তি ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এত ভালো করতেন যা সবাইকে চমকে দিত। শিক্ষকগণও তাঁর প্রতিভা দেখে বিস্মিত হতেন। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন কবিতা রচনাও শুরু করেন। বলাই বাহুল্য সেগুলো শিশুদের উপযোগীই ছিল। এও লক্ষণীয় যে ক্রমান্বয়ে তাঁর রচনা অনেক বেশি পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে উঠেছিল।

চারদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ১৯১৮ সালে নজরুল স্কুল ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। শিশু নজরুল শৈশব পেরিয়ে কবি নজরুলে পরিণত হলেন।

পৃথিবী যত বুড়ো হবে মানুষের সংগ্রামের পরিধিও তত বেশি বাড়বে। সেই ধারাবাহিকতায় একটি বিশেষ যুগের প্রতিভূ হিসেবে নজরুল তাঁর তারুণ্য, আবেগ, উদ্দীপনা, মানবিক চেতনা ও সংগ্রামী স্বপ্ন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিলেন। তিন বাংলা সাহিত্যে এলেন ঝড়ের মতো। মাত্র তেইশ বছর (১৯১৯–১৯৪২) তাঁর সাহিত্য রচনার সময়কাল। এই অল্প সময়ের মাঝেই তাঁর প্রতিবাদী উচ্চকিত কণ্ঠ ও ক্ষুরধার লেখনী সমাজজীবন ও মানুষের বোধে নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি যে শুধু সংগ্রামী ও বিদ্রোহমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা নয়– প্রেম, প্রকৃতি, হাস্যরস, শিশুবিষয়ক রচনাও তাঁর নিতান্ত কম নয়। এক কথায় সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।

নজরুল শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন কিছুটা নিজের হৃদয়ের তাগিদে আর কিছুটা পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধে। সংখ্যায় যে তা খুব বেশি এমনও নয়। কিন্তু যেটুকু সৃষ্টি করেছেন তা সৃজনশীলতার মাপকাঠিতে অত্যন্ত সফল ও সমৃদ্ধ। এগুলো বেশিরভাগই গদ্যে-পদ্যে মেশানো। সংখ্যায় একশোর কাছাকাছি। কিন্তু এর মাঝে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য চমৎকার নিটোল প্রয়াস ছিল। শিশু হৃদয়ের সুখ কল্পনা ও দুষ্টুমিভরা চপলতার প্রাণখোলা দিকগুলো তিনি তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে চিত্রিত করেছেন। পূর্বসূরি

লেখকগণের মতো তিনি শিশুমনকে শুধু রূপকথা-উপকথার রাজা-রানি অথবা দৈত্যদানোর জগতে আটকে রাখেননি। লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য অনেকটা কোমল জগৎ থেকে শিশুদের টেনে রাতারাতি বড় করে দিয়েছে। কিছুটা দার্শনিকতার ভারে ক্লান্ত। যেমন 'তালগাছ' কবিতায়–

"তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়–
একেবারে উড়ে যায়–
কোথা পাবে পাখা সে?"

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর শিশুসাহিত্যে দেখেছি বাংলা ভাষার কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষনিরীক্ষা ও কিছু উপদেশ। শিশু হৃদয়ের মোলায়েম জায়গাটি তা স্পর্শ করতে পারেনি।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র রূপকথার চমৎকার গল্প সৃষ্টি করে শিশুদের হৃদয়কে অনেকটা জয় করে নিয়েছিলেন। বাঙালির ঘরে দাদি-নানিদের গল্প বলার অশেষ ক্ষমতা ছিল। ছোটবেলায় এঁদের কাছে যাঁরা গল্প শোনেননি তাঁরা হতাভাগ্য বলতে হবে। এই গল্পের রেওয়াজ দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যের উপকরণকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমসাময়িক কবি। রবীন্দ্র কাব্যের গাম্ভীর্য থেকে সত্যেন্দ্রনাথ অনেকটা দূরে ছিলেন। ফলে একটা শিশুসুলভ তরল মন নিয়ে তিনি শিশুদের জন্য কবিতা রচনা করেছেন। ছন্দের জাদুকর হিসেবে তাঁর কবিতা শিশুদের ছোট্ট হৃদয়কে স্বপ্নাচ্ছন্ন ও আমোদিত করতে সক্ষম হয়। রেলগাড়ির গতি নিয়ে তিনি লিখেছেন–

"এ কি! এ কি! এ কি দেখি! ঢেঁকি ঢেঁকি ভাই–
ঘোড়া-চুলো গাছগুলো ছোটে বাঁই বাঁই
উঁকি মেরে ঝাৎ করে
সরে যায় কাৎ করে– নাই আর নাই।"

এরপর সুকুমার রায়ের শিশু সাহিত্যে দেখা গেল নির্মল আনন্দের ছড়াছড়ি। পূর্বতন রীতি ছেড়ে নতুন ধারায় রস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায় তাঁর রচনায়। একাধারে তিনি সামাজিক জীবনের অসংগতিগুলো

চিত্রিত করেছেন এবং শিশুদের মাঝে উপভোগ্য করে তা তুলে ধরতে পেরেছেন। অসামান্য প্রতিভার জোরে সুনির্মল বসু সমসাময়িকগণের মাঝে নিজের আলাদা একটি স্থান করে নিয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে নজর ল তাঁর মানসগঠন, চিন্তাচেতনা ও ভাব-ভাষার কৌশলে শিশু সাহিত্যের জগতে নিজের একটি গৌরবময় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর শিশুসাহিত্য একান্তই শিশুদের জন্য সৃষ্টি। বড়দের গাম্ভীর্য প্রকাশের সুযোগ এখানে নেই। প্রত্যেকটি রচনাতেই শিশুদের সহজসরল মনের উদ্দাম, উচ্ছলতা ও রসময়তায় পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর শিশুতোষ রচনাগুলো শিশুদের নির্মল শৈশবকে অনেক বেশি আনন্দমুখর ও সাবলীল সুখময়তায় ভরে তোলে।

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে নজর লের প্রথম শিশুতোষ কবিতা 'চড়ুই পাখির ছানা'। তাঁর মতে ১৯১৮ সালে কবি যখন রানীগঞ্জ সিয়ারশোল স্কুলের ছাত্র তখন এটি রচিত হয়। এ কবিতায় চড়ুই মা আর তার ছানাটির ব্যথা-বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। দুষ্ট ছেলেদের হাতে পড়ে ছানাটির দুরবস্থা দেখে মা-পাখির কী বেদনা তা বুঝতে পারে আর একটি মাতৃহারা সুবোধ ছেলে। সে পাখির ছানাটিকে মই এনে আবার তুলে দেয় পাখির বাসায়।

"অবাক-নয়ান মাটি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয় ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!"

পাখিছানার প্রতি এ ভালোবাসা থেকে বোঝা যায় তিনি কতটা মানবদরদি ছিলেন। নজর লের প্রথম শিশুতোষ রচনা 'ঝিঙে ফুল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এটি ছোট একটি বই। এতে আছে মাত্র তেরোটি কবিতা। নাম কবিতা 'ঝিঙে ফুল'।

অতি সাধারণ একটি সবজির হলুদ ফুলকে অসাধারণ সৌন্দর্যে ম িত করে এ কবিতায় এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। শিশুদের তাজা প্রাণ যেন এ কবিতার উজ্জ্বল সৌন্দর্য ও ছন্দের তালে তালে নেচে ওঠে।

"ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল–

ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল–
ঝিঙে ফুল ॥
... ...
প্রজাপতি ডেকে যায়–
বোঁটা ছিঁড়ে চ'লে আয়!'
আসমানে তারা চায়–
চ'লে আয় এ অকূল!'
ঝিঙে ফুল ॥"

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতাটি বর্ণে-গন্ধে অপূর্ব-সুন্দর। কবিতার রংও যে কত বর্ণিল হতে পারে তা এ কবিতা পড়লে বোঝা যায়। শিশুমন হলুদ ঝিঙে ফুলের মতো দোলায়িত হয়। এ গ্রন্থের বেশিরভাগ কবিতাই কৌতুক ও আনন্দ রসে ভরপুর। কোথাও কোথাও বাঙালি পরিবারের মধুর সম্পর্কগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে আরও মধুরতর হয়ে ফুটে উঠেছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল আবদার চাওয়াপাওয়া নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। একটি ছোট মেয়ের পেয়ারা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। তাই সে কাঠবেড়ালির কাছে পেয়ারা চাইছে,– অনুরোধ করছে, লোভ দেখাচ্ছে, ভয় বকুনিও দিচ্ছে। অত্যন্ত হাস্যকর ও আমোদজনক একটি দৃশ্য 'খুকী ও কাঠবেড়ালি'র কবিতায়–

"ইস! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!
কাঠবেড়ালি! তুমি আমার ছোড়দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি! তবে একটা পেয়ারা খাও না! উঃ!
... ...
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট? অ-মা দেখে যাও!–
কাঠবেড়ালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!"

শিশুদের শিশুসুলভ আচরণ কত-যে মজার ও হাসির হয় 'খোকার খুশি' কবিতায় তা লক্ষণীয়–

"বিবাহ! বাবা, কি মজা?
সারাদিন মত্তা গজা

গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে।

তবু বর হচ্ছিলে ভাই,
বরের কি মুশকিলটাই–
সারাদিন উপোস মশাই
শুধু খাও হরিমটর?
শোন ভাই, মোদের যবে
বিবাহ করতে হবে–
'বিয়ে দাও' বল্‌ব, 'তবে
কিছুতেই হচ্ছিনে বর'!"

এ কবিতায় শিশু মনের হাস্যরসপূর্ণ অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। বিয়ের শখ আছে কিন্তু বর হওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতে রাজি নয়। অথচ বিয়ের সবটুকু আনন্দ উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে উপভোগ করতে চায়।

নজর‍ুল তাঁর কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এ কথা সর্বজনবিদিত। শিশুদের জন্য রচিত কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। 'খোকার খুশি' কবিতায় বরের যে কষ্টের চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা হিন্দু ঐতিহ্য থেকেই নেওয়া। এমনি উদাহরণ আমরা 'খাঁদু দাদু'তেও দেখতে পাব–

"অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা-নাক ডেঙাডেং ড্যাং?
... ...
দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক্,
ঘুস দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজ্‌তো সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থ্যাবড়া সেরে ধ্যাবড়া করেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি নাক ডেঙাডেং ডেং!"

দাদু ও নাতির মাঝে সুন্দর এক রসিকতাময় হাসির চিত্র। দাদু ও দিদিমা (নানা ও নানি)-র সাথে নাতি-নাতনির সম্পর্ক সব সময়ই খুব মধুর হয়ে থাকে। শিশুরা কী করে যে বোঝে দাদু ও দিদিমার সাথে রঙ্গরস করা যায় তা নজর‍ুল অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন মনস্তাত্ত্বিকের মতো এ কবিতায় বিশে- ষণ করেছেন। দাদুও দিদিমা পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে হিন্দু পরিবারেই মায়ের বাবা-মাকে ডাকতে ব্যবহার করা

হয়। মুসলিম পরিবারে নানা-নানি (নানু) রূপে ডাকা হয়। নজর‍ুলের শুধু এ কবিতা নয় এমনি অনেক কবিতাকেই তিনি হিন্দু ঐতিহ্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মুসলিম ঐতিহ্যপূর্ণ কবিতাও রয়েছে। মূলত এ দুটো ঐতিহ্যের ধারা থেকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের মূল-সুর-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন এবং এর সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াসও ছিল তাঁর সৃষ্টিতে।

গল্প শুনতে শিশুরা অত্যন্ত ভালোবাসে। নিজের কল্পনাপ্রসূত গল্প বিশ্বাসযোগ্য করে বলার চেষ্টা শিশু মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ দিক। 'খোকার গপ্‌প বলা' কবিতায় খোকা তার গপ্‌পের হরেক রকম বর্ণনা দিয়েছে। এমনকি সে গানও জানে–

"বল্‌লে খোকন, 'গপ্‌প জানি, জানি, আমি গানও!'
বলেই– ক্ষুদে তান্‌সেন সে তান জুড়ে জোর দিল–
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!
... ...
একদিন না রাজা–
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় গজা!
রাণী গেলেন তুলতে কল্‌মী শাক
বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক!
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বেড়াল-বাচ্চা শিকার করে!'
এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ!
রাজবাড়িতে আগোড় দেওয়া রাণী কোথায় গাপ!"

'খোকার গপ্‌প বলা'য় শিশুমনের আজগুবি কাহিনির অবতারণা হয়েছে। এ ধরনের আষাঢ়ে গল্প শিশুরা যেমন শুনতে ভালোবাসে তেমনি বলতেও পছন্দ করে। এ ধরনের কল্পনার জগতে বিচরণ করে শিশুরা; কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা ছাড়াই কাহিনি বলতে থাকে। তাদের নিজস্ব জগতে এগুলো তারা বিশ্বাসও করে। তাই শিশুদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় 'হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!' রাজা ফড়িং শিকার করতে গিয়ে হাতির মতন একটা বেড়াল-বাচ্চা শিকার করে– এই অদ্ভুত তত্ত্ব শিশুমন নানা ধরনের কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েই বর্ণনা করে থাকে। যা বড়দের পক্ষে বলা সম্ভব হয় না। এই নির্দোষ কল্পনার জগতে রাণী ও কল্‌মিশাক তুলতে যান। মানবজীবনের শৈশব যে কত মধুর নির‍ুপদ্রব শান্তি ও কল্পনামুখর হয়ে থাকে কবি 'খোকার গল্প বলা'য়

তা অত্যন্ত আন্তরিক ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শিশু মনস্তত্ত্বের মাঝে ডুব মেরেই যেন তিনি এ অনুভূতিগুলো প্রকাশ করেছেন।